গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৯ বর্ষ ২ সংখ্যা ৫ - ১১ আগস্ট ২০১৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

৫ই আগস্ট স্মরণ দিবসে
কমরেড শিবদাস ঘোষের
অমূল্য শিক্ষা থেকে

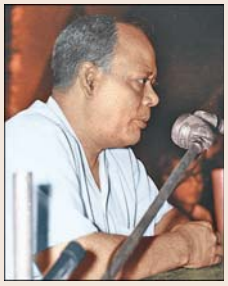

... যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখতে চান, তাঁদের কাছে বলব, এই বিপ্লবী তত্ত্ব তাদের কাছ থেকেই শিখতে হবে, যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে, সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং সফল হয়েছে। যারা ব্যক্তিগত জীবনে আচার, রুচি, অভ্যাসে আজও বুর্জোয়া সংস্কৃতির শিকার, তাদের কাছ থেকে আপনারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখবেন না। কারণ, তারা মার্কসবাদের নামে যা শেখায়, বিপ্লবের নামে যা শেখায়, তা আসলে ভুল শেখায়। রাজনৈতিক বুকনির বাইরে ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে যা ইচ্ছে যারা করে বেড়ায়, সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে যেমন নেতার যেমন কর্মীর যা ইচ্ছে যাদের ব্যাখ্যা থাকে, তেমন করে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টির চলতে পারে, মার্কসবাদী পার্টির এভাবে চলার রীতিও না এবং চলতে পারেও না। এবং যে পার্টি মার্কসবাদের নামে এমনভাবে আচরণ করে, বুঝতে হবে, সে পার্টি আসলে মার্কসবাদের তকমা এঁটে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি। তারা বিপ্লবের নামে যে সংগ্রাম করে তা বিপ্লব নয় এবং বিপ্লবের নামে যা বলে তা শুধু বুকনি মাত্র, বুলিসর্বস্বতা মাত্র, তার মধ্যে বিপ্লবী তত্ত্বের প্রাণ নেই, বিপ্লব নেই। কাজেই তাদের কাছ থেকে মার্কসবাদ শিখতে গেলে তা মার্কসবাদের নামে আসলে অন্য জিনিস শেখা হয়। আর এরই ফলে 'মার্কসবাদ' 'মার্কসবাদ' বলে যে জিনিসের চর্চা এ দেশে চলেছে, তাতে বিপ্লবী মার্কসবাদের চর্চা হয়নি, সাম্যবাদের সত্যিকারের তত্ত্ব, সংস্কৃতি এবং আদর্শের ভিত্তিতে বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা হয়নি এবং এইসব তথাকথিত মার্কসবাদীদের কার্যকলাপ ও আচরণের জন্যই মার্কসবাদের মতো, কমিউনিজমের মতো একটা অমন উচ্চ মহান আদর্শের মর্যাদাও জনসাধারণের চোখে আজ অনেকখানি হেয়ে হয়ে পড়েছে। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যদি

সাতের পাতায় দেখুন

'গো-প্রেম' আসলে বিজেপির ভোটের তাস

গুজরাটের সৌরাষ্ট্র এলাকার উনা শহরের কাছে এক গ্রামে ১৯ জুলাই মৃত গরুর চামড়া ছাড়ানোর অপরাধে বিজেপি মদতপুষ্ট 'গো-রক্ষা' বাহিনীর হাতে নিগৃহীত হয়েছে চামড়ার কারবার করা এক দলিত পরিবার এবং তাদের প্রতিবেশীরা। আহত সাতজন, তাদের চারজনকে গ্রাম থেকে তুলে উনা শহরে নিয়ে গিয়ে মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে নগ্ন অবস্থায় হাঁটিয়ে নিয়ে যায় এই গো-রক্ষকরা। পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। এই চার যুবক গুরুতর আহত অবস্থায় উনার সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উপরেও চাপ দেওয়া হয়েছিল তাদের অবস্থা গুরুতর নয় বলে রিপোর্ট দিতে। কিন্তু লাগাতার আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত এই আহতদের আমেদাবাদের হাসপাতালে ভর্তি করে তাদের চিকিৎসা শুরু করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা গুজরাট জুড়ে প্রতিবাদে নেমেছেন দলিত সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ। রাজধানী আমেদাবাদ সহ রাজ্যের একটা বিরাট অংশ লাগাতার বনধ এবং হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মৃত পশুর শব ভাগাড়ে ফেলার কাজ যে সব দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ করেন, তাঁরা গরুর দেহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের সামনে ফেলে লাগাতার বিক্ষোভ দেখিয়ে স্লোগান তুলেছেন— গরু যাদের মা, তারাই তার সৎকারের ব্যবস্থা করুক। সাতজন প্রতিবাদকারী বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। সংসদেও ঝড় সামলাতে হয়েছে বিজেপি সরকারকে। বিজেপি নেতৃত্ব উত্তরপ্রদেশের আসন্ন নির্বাচনে এবং গুজরাট সহ অন্যান্য রাজ্যে দলিত ভোট হারানোর আশঙ্কায় চিন্তিত। তাই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি সেই গ্রামে ছুটে গেছেন। একইভাবে ভোটের

দুয়ের পাতায় দেখুন

হায়দরাবাদে নারী নির্যাতন বিরোধী কনভেনশন

নারী নির্যাতন ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে ২১ জুলাই হায়দরাবাদের প্রেস ক্লাবে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অল ইন্ডিয়া এম এস এস আয়োজিত এই কনভেনশনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ছায়া মুখার্জী, সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি ই হেমলতা। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রমীলা, গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক সুজাতা, এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড আর গঙ্গাধর প্রমুখ।

কংগ্রেস-বিজেপি সব সরকারই কাশ্মীরের জনগণকে শত্রু ভাবছে

ছররা গুলিতে ক্ষতবিক্ষত ১৪ বছরের কাশ্মীরি কিশোরী ইনসা মালিক। তার অপরাধ, বাইরের বিক্ষোভ জানলা দিয়ে সে দেখছিল। পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর ছররা বুলেট তার মুখে চোখে অসংখ্য ক্ষত তৈরি করে দিয়েছে। সে এখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ভারতীয় সেনা তার তরুণ দু'টি চোখের দৃষ্টি ছিনিয়ে নিয়েছে। গুলির আওয়াজে শঙ্কিত এক প্রৌঢ় ছেলের খোঁজে দ্রুত বাড়ি ফিরলে সেখানেও সামরিক বাহিনী তাঁকে টেনে পিটিয়ে হত্যা করে।

এমন উদাহরণের শেষ নেই কাশ্মীর উপত্যকায়। কোনও ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সন্ত্রাসবাদের সমর্থক পর্যন্ত নয় এমন সাধারণ কাশ্মীরি নাগরিকদেরও প্রাণ চলে যাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ভারতীয় সেনা যেন গোটা উপত্যকার মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রতিদিন রক্তাক্ত হচ্ছে ভূস্বর্গ।

এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির মধ্যে হিজবুল মুজাহিদিন-এর সদস্য বুরহান ওয়ানিকে গত ৮ জুলাই গুলি করে হত্যা করে নিরাপত্তা বাহিনী। বাহিনীর বক্তব্য জঙ্গিদের সাথে গুলি বিনিময়ে অর্থাৎ এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে ২২ বছরের তরুণ ওয়ানি সহ আরও দু'জন। তবে গ্রামবাসীদের বক্তব্য, সামরিক বাহিনী বাড়ি ঘিরে ফেললে ওয়ানি সহ তার সাথীরা পালাতে যায়। সেই সময় তাদের গুলি করে হত্যা করে বাহিনী।

বুরহান সম্পর্কে পুলিশের কর্মকর্তাদেরই বক্তব্য, সে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে কোনও সংঘর্ষে কোনও দিন অংশ নেয়নি। নিরাপত্তা বাহিনীর অত্যাচারের ভয়াবহ সব ছবি

ছয়ের পাতায় দেখুন

ফেব্রুয়ারিতে ধান কিনেছে সরকার
এখনও টাকা পায়নি জঙ্গলমহলের ৬ হাজার চাষি
জেলাশাসককে এস ইউ সি আই (সি)-র ডেপুটেশন

জঙ্গলমহল হাসছে বলে বর্তমান সরকারের প্রচার এখন তুঙ্গে। কিন্তু ভিক্ষার দানছত্র ছাড়া প্রদীপের তলায় যে অন্ধকার কে তার খবর রাখে? কেন ভিখারি সৃষ্টি হচ্ছে, কেনই বা এত ফলাও করে কল্পতরু সাজতে হচ্ছে? খরাপ্রবণ এলাকায় কৃষির বিন্দুমাত্র উন্নতি নেই। কর্মসংস্থানের কোনও প্রকল্প নেই। শিক্ষা-স্বাস্থ্য তলানিতে। জংলা গাছের শেকড়, লতাপাতা সেদ্ধ, ইঁদুরের মাংস, আর পিঁপড়ের ডিম খেয়ে কোন সুখে মানুষগুলো বাঁচার লড়াই করে চলেছে তা বাইরে থেকে বোঝা শক্ত। বামফ্রন্ট আমলে অনাহারে বুধু শবরদের মৃত্যু নিয়ে কিঞ্চিৎ তোলপাড় হওয়ায় তদানীন্তন দাম্ভিক মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন 'ও অমন কত আমলাশোল আছে!' কী পরম তৃপ্তির উদ্গারিত বাণী! আর বর্তমান আমলের চিল-চিৎকারে এসব কিছু যেন ঢাকা পড়ে গেছে।

সংবাদ ছোট, বেদনার চরিত্র বড়, দুর্দশাটা বোঝা যায়। কৃষকের বন্ধু হয়ে আমন ধান কিনতে নেমেছিল সরকার এবং সরকার অনুমোদিত নানা সংস্থা। কবে? গত পৌষে। কে জানত তা

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘গো-প্রেম’ বিজেপির ভোটের তাস

একের পাতার পর

হিসাব কষেই দলিতদের ত্রাতা সাজার তাগিদে কংগ্রেস সহসভাপতি থেকে শুরু করে দিল্লির আপ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সেখানে ছুটেছেন।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই ২৬ জুলাই বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে মান্দসউর রেল স্টেশনে দুই মুসলিম মহিলাকে এই তথাকথিত ‘গোমাতার ভক্তরা’ প্রবল মারধোর করে। এখানেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকাতেই ছিল। বিজেপি-আরএসএস-ভিএইচপির স্বনিযুক্ত গো-রক্ষকরা ‘গোমাতা কি জয়’ ধ্বনি তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সালমা মেভাতি এবং শামিম হোসেন নামের ওই দুই মহিলাকে মারতে মারতে তার ভিডিও ক্লিপ তুলে নিজেরাই ছড়িয়ে দেয়। যাতে এই ছবি দেখে সারা দেশে আতঙ্ক তৈরি হয়। গুজরাটের ঘটনাতেও একইভাবে ছবি তুলে ক্রিমিনাল বাহিনী সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিল। পুলিশও গো-রক্ষক হিসাবে এত কর্তব্যপরায়ণ হয়ে পড়ে যে, আক্রমণকারীদের কিছু না বলে দুই মহিলাকে গ্রেফতার করে গো-হত্যার অভিযোগে শাস্তি দিতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যদিও প্রমাণ হয়ে গেছে তাঁদের কাছে মোষের মাংস ছিল, গরুর নয়। কিন্তু যদি মাংসটা গরুরই হত তাতেও কি এই আক্রমণকে কোনও মানুষ সমর্থন করতে পারে!

গুজরাটের দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বলে বিষয়টি নতুন করে সামনে এসেছে। কিন্তু বিগত দু’বছর ধরে বিশেষত বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে আসার পর থেকে সারা দেশেই গরু বাঁচানোর নাম করে সংখ্যালঘু মুসলিম এবং দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের উপর একই ধরনের আক্রমণ চলছে। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটকে গো-রক্ষার জিগির তোলা বিজেপির মদতপুষ্ট নানা বাহিনী কাজ করছে। যখন তখন আক্রমণ, গাড়ি আটকে মারধোর, গোবর-গোমূত্র জোর করে খেতে বাধ্য করা, প্রকাশ্যে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানো এ সব তো করছেই, এমনকী এই অজুহাতে মুসলিম ও দলিতদের হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যথারীতি মূক ও বধিরের ভূমিকায়।

এবার একটা অন্য চিত্র দেখা যাক, কিছুদিন আগেই একটা ছবি দেখে অনেকেই শিউরে উঠেছিলেন— রাজস্থানের পথে-ঘাটে পড়ে রয়েছে শ’য়ে শ’য়ে মরা গরু। সে ছবি গণমাধ্যমের সৌজন্যে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে, এমনকী বিশ্বের নানা প্রান্তেও। যে রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে আরএসএস-এর রাজনৈতিক শাখা বিজেপি এবং যেখানে নজিরবিহীনভাবে ‘গো-পালন মন্ত্রক’ সৃষ্টি করে সেখানে একজন মন্ত্রীকেও তারা বসিয়ে রেখেছে, সে রাজ্যে এ ঘটনা ঘটে কীভাবে?

এবারের গ্রীষ্মে তীব্র খরার প্রকোপে কয়েক কোটি মানুষের জীবন সংকটাপন্ন হয়েছে। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের রেলযাত্রীদের অভিজ্ঞতা হয়েছে, রেল লাইনের ধারের গ্রামের মানুষ এমনকী চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে, ট্রেনের টয়লেট থেকে থেকে জল ভরে নিচ্ছে বোতল-বালতি-মগে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই। আর এই খরায় সরকার জলের কোনও ব্যবস্থা না করায় জলের অভাবে বেঘোরে প্রাণ গেছে শত শত গরু এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুর। এ-রকমটা হলে হিসেব মেলা যে মুশকিল হয়ে যায়। কারণ, কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গো-হত্যা, গো-মাংস নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক রাজনীতিতে বিজেপি আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নেতা-মন্ত্রীরা একের পর এক সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্য করে চলেছেন। গোটা দেশে গো-হত্যা বন্ধের আইন জারি করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গরু নিয়ে গবেষণার জন্য গোটা দশেক ‘রিসার্চ সেন্টার’ স্থাপন এবং বেশ কয়েকটি গো-অভয়ারণ্য খোলার পরিকল্পনাও হয়েছে। এতেই শেষ নয়। শিশুমনে গো-ভক্তি জাগাতে স্কুলপাঠ্যে গরুর জবানিতে চিঠি ছাপা হচ্ছে। হাসপাতালে ফিনাইলের পরিবর্তে গরুর মূত্র ব্যবহারের নির্দেশিকা জারি হচ্ছে। বলাই বাহুল্য, সেটা গরুর প্রতি কোনও সাধারণ ভক্তি থেকে নয়, বরং অতিভক্তি থেকে। আর, অতিভক্তি কীসের লক্ষণ সে তো সকলেরই জানা।

শাস্ত্রানুসারে গরু হিন্দুদের কাছে দেবী রূপে কল্পিত হলেও চাষের সময় লাঙল টানতে না পারলে চাষিরা গরুর পিঠে লাঠি চালাতে দ্বিধা করে না। বুড়ো হয়ে গেলে বহু হিন্দু চাষি তাকে বিক্রি করাকেই অর্থনৈতিকভাবে শ্রেয় মনে করে। আবার গরু এবং মহিষের মাংস সারা পৃথিবীর সাথে ভারতেরও একটা বিরাট অংশের মানুষের খাদ্য। বৈদিক যুগে মুনি-ঋষিদের মধ্যেও গো-মাংস ভক্ষণের চল ছিল, ইতিহাসে তার প্রমাণ বিস্তর। তা ছাড়া, বিজেপি নেতারা যে হিন্দুত্বের ধ্বজা ওড়ায় তা কি কোনও ধার্মিক মন থেকে? ‘গোরক্ষিণী সভা’র কর্মকর্তাদের স্বামী বিবেকানন্দ প্রশ্ন করেছিলেন, মধ্য ভারতের লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের জন্য তাঁরা কী করেছেন? তারা গরুকে মাতৃরূপে পুজো করে অথচ মানুষের জন্য কিছু করে না শুনে তাঁর তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্য ছিল, এমন মাতা না হলে এমন সব সন্তান আর কে প্রসব করবেন? বিজেপি-আরএসএস-কে হিন্দু ধর্মের রক্ষক বলে মানতে হলে বিবেকানন্দকে আর তো হিন্দু বলা চলে না! রবীন্দ্রনাথও এই গো-রক্ষার জিগিরের বিরোতা করেছিলেন, ‘...এ দেশে মহিষও দুধ দেয়, মহিষও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই, তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয়, তবে ওটা ধর্ম নয়। ওটা অন্ধ সংস্কার।’ (ঘরে বাইরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় গরু কেনা বেচার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিজেপি-আরএসএস-এর গো-রক্ষা বাহিনী লাঠিসোটা এমনকী বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে, যাতে কৃষকরা তাদের অপ্রয়োজনীয় এবং বৃদ্ধ গরু বিক্রি করে দিতে না পারে। সারা দেশেই কৃষকদের কাছে এই অকেজো গবাদি পশু বিক্রি করতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। না হলে এই পশুদের ভরণপোষণ করতে গিয়ে তার সংসারে অভাব অবশ্যম্ভাবী। খরা বা অন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এই প্রয়োজন আরও ভয়ঙ্করভাবেই এসে পড়ে। মানুষ তার প্রয়োজনেই যেমন গবাদি পশুর যত্ন করে, তাকে ক্লেশের হাত থেকে বাঁচায়। আবার প্রয়োজনেই তাকে বিক্রি করে দেয়, সেই পশু অন্য কোনও কাজে লাগে। পশুদেহের নানা অংশ থেকে বহু প্রয়োজনীয় জিনিস আহরিত হয়। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বাধা দিলে কী হয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছে রাজস্থান সহ খরা কবলিত এলাকার লক্ষ লক্ষ গবাদি পশুর বেওয়ারিস শব। কৃষকরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে এদের বিক্রি করার কোনও উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়েছে মাঠে-ঘাটে রাস্তায় ছেড়ে দিতে। ফলে এই অসহায় মৃত্যুই এই অবলা পশুগুলির একমাত্র ভবিতব্য রূপে দেখা দিয়েছে। এর জন্য দায়ী হিন্দুত্বের স্বঘোষিত অভিভাবক বিজেপি-আরএসএস নেতারাই। হিন্দুত্ব এদের কাছে ভোটে জিতে মসনদের নাগাল পাওয়ার একটা সিঁড়ি মাত্র, গো-ভক্তিও তাই। ভোটের জন্য এরা হিন্দু মানুষকেও দাঙ্গায় ফাঁসিয়ে বলি দিতে কসুর করে না। গরুকে নিয়ে এর থেকে বেশি তারা কী করবে! উগ্র হিন্দু জাত্যভিমানের প্রসার ও অহিন্দুদের প্রতি চরম বিদ্বেষ ছড়ানো, আরএসএস-বিজেপি গদি দখলের জন্য এই হাতিয়ারকেই আশ্রয় করেছে। এ ছাড়া তাদের আর কোনও কর্মসূচি নেই। তারা ধারাবাহিকভাবে সেই কাজটাই করে যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ফসলের দাম না পেয়ে অসংখ্য চাষির আত্মহত্যা, নির্যাতিতা নারীর আর্তনাদের মতো জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তাদের আসল অভিভাবক পুঁজিপতি শ্রেণিকে সন্তুষ্ট করাই আরএসএস-বিজেপির গোপন এজেন্ডা।

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং-এর মতো বিপ্লবীরা ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আরএসএস ছিল তার বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের গান্ধীবাদী আপসমুখী নেতৃত্ব ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা চাইলেও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা জাতির জীবনে আনতে চায়নি। সেই আপসমুখী ধারার প্রধান চরিত্র মহাত্মা গান্ধীও ১৯৪৭ সালের ২৫ জুলাই, এক প্রার্থনা সভায় বলেছিলেন, “ভারতে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে কোনও আইন করা যাবে না।...আমিও দীর্ঘকাল গো-সেবা করেছি। কিন্তু আমি কী করে আশা করতে পারি যে আমার ধর্ম ভারতের বাকি সব মানুষের ধর্ম হবে? এর অর্থ হল ভারতে যাঁরা হিন্দু নন তাঁদের উপর দমন-পীড়ন নামিয়ে আনা।” তিনি ওই প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন যে, “আমরা প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে তা না জেনে শুধু গো-হত্যা বন্ধ করতে হবে বলে চেঁচাচ্ছি।”

একটা বিষয় লক্ষণীয়, এত কিছু করেও বিজেপি তাদের ‘যুক্তি’ বিরাট অংশের মানুষকে গেলাতে পারছে না। তাই তৈরি করছে ‘গরুর আর্থিক গুরুত্ব’ নামক রচনাবলি। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও হালে পানি পেতে যথেষ্টই বেগ পেতে হচ্ছে তাদের। কারণ, বাস্তবে বিফ বা গরু-মোষের মাংসের বাণিজ্যে ভারত প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করে। গত আর্থিক বছরে যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। টাকার ক্ষেত্রে জাত-ধর্মের বালাই রাখা যায় না। ফলে, হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী ভিএইচপি-আরএসএসের বহু রাঘব-বোয়ালও এই ব্যবসার সাথে যুক্ত। দ্বিতীয়ত, ভারতে গরুর সংখ্যা কমে যাওয়ার কোনও ইতিহাস নেই এবং বর্তমানে, এমনকী সুদূর ভবিষ্যতেও, তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই।

বরং অর্থনৈতিক কারণেই গোমাংস বা দুধ ইত্যাদির ব্যবসা লাভজনক হলে এর প্রজননও বেশি গুরুত্ব পাবে। বিজেপি সরকার অহিন্দুদের মাথা ফাটানোর জন্য লাঠি ধরার বদলে খরা কবলিত এলাকায় জলের ব্যবস্থা করলে, বা কৃষকদের আয়ের ব্যবস্থা করলে। কয়েক কোটি মানুষ এবং কয়েক লক্ষ গরুর জীবন সত্যিই বাঁচতে পারে। এই কাজটুকু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তাঁরা ভোটে জিতেছেন। এটুকুও করতে না পারলে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের কর্তব্য, আন্দোলনের ধাক্কা দিয়ে রাজনীতির ময়দান থেকে তাদের ছুঁড়ে ফেলা।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর লোকালের বিশিষ্ট কর্মী কমরেড সুবোধ পড়িয়া স্বল্প রোগভোগের পর ১০ জুলাই নিজ গৃহে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার চাঠরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত বিষ্ণুপদ পড়িয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। যাঁর প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল। বর্তমান ভোগবাদী সমাজের জটিল ও পঙ্কিল আবর্তে নিজেকে নিমজ্জিত না করে—এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭৩ সালে বর্তমান রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসুর সান্নিধ্যে এসে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাথে যুক্ত হন এবং দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা-পার্টির তদানীন্তন সদর কার্যালয় তমলুকে অবস্থিত অঙ্গীকার প্রেসের মুদ্রণ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ১৯৮২ সালে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি মেদিনীপুর শহরে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলা পরিষদ প্রেসে অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন। দীর্ঘ ৩০ বছর কাজ করলেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে তাঁকে বিগত বামফ্রন্ট সরকার কিংবা বর্তমানের তৃণমূল সরকার স্থায়ী কর্মচারীর মর্যাদা দেয়নি। চরম দারিদ্রের মধ্যে থেকেও তিনি দলের মূল নীতি ও আদর্শের প্রতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিচল থেকেছেন।

তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন, কিন্তু তাঁর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, মধুর ও অমায়িক ব্যবহার এবং পার্টির কাজে নিষ্ঠা এলাকার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তাঁকে ও পার্টিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ শোনার সাথে সাথে দলের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি এবং লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রাণতোষ মাইতি সহ এলাকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শুভানুধ্যায়ীরা এবং স্থানীয় কমরেডরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। মরদেহ কর্নেলগোলায় দলের জেলা কার্যালয়ে নিয়ে আসা হলে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বর্ষীয়ান কমরেড দিলীপ ব্যানার্জী সহ উপস্থিত অন্যান্য গণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মরদেহে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান। ২০ জুলাই মেদিনীপুরে ভূপেন্দ্রনাথ ভবনে তাঁর বিপ্লবী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড সুবোধ পড়িয়া লাল সেলাম

সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা ভেবে দেখবেন

কংগ্রেসের সাথে যে কোনও মূল্যে জোট চালিয়েই যেতে হবে — এই বার্তা দিতে পশ্চিমবঙ্গ সিপিএম নেতৃত্বের মরিয়া ভাব, সম্প্রতি দু'টি ঘটনায় আরও প্রকট হল। দক্ষিণ কলকাতায় জনৈক কিশোরের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাতেও সিপিএম নেতারা এককভাবে না গিয়ে কংগ্রেসের পরিষদীয় নেতার সাথে হাত ধরাধরি করে গেলেন। দ্বিতীয়টি আরও অভিনব। সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্প্রতি ওই জেলায় বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিধায়কদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানেও শুধু সিপিএমের বিধায়ক নয়, কংগ্রেসের নির্বাচিত বিধায়কদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়, বক্তব্যও রাখেন রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা। সিপিএম নেতৃত্ব বলেছিল, তৃণমূলের সন্ত্রাসের মোকাবিলাতেই কংগ্রেস-সিপিএম জোট জরুরি। যেখানেই সন্ত্রাস ঘটবে, সেখানেই জোট বেঁধে তাঁরা থাকবেন। যে দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হল, তার কোনওটিতেই তৃণমূলের সন্ত্রাসের সম্পর্ক ছিল না।

সিপিএম নেতাদের আচরণ থেকে স্পষ্ট যে, তাঁরা জাতীয় বুর্জোয়া দল কংগ্রেসের সাথে নিজেদের নিকৃষ্ট সুবিধাবাদী নীতিহীন জোটকে গ্রহণযোগ্য করার জন্যই তৃণমূলের সন্ত্রাসের কথা বলছেন। তৃণমূল সন্ত্রাস করছে, এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। সমগ্র রাজ্যে নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করার জন্য টাকার থলি আর লাঠি-বন্দুক নিয়ে তৃণমূল নেমে পড়েছে এ কথা সত্য। কিন্তু তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য, লড়বার জন্য সিপিএমকে কেন কংগ্রেসের মতো চরম অগণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশপরা একটি দলের হাত ধরতে হবে? যে কংগ্রেসের সন্ত্রাসী রেকর্ড এ রাজ্যের মানুষ ভুলতে পারেন না। সিপিএম নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী, তৃণমূল শাসনের গত পাঁচ বছরে সিপিএমের ১৭৬ জন কর্মী তৃণমূলের হাতে নিহত হয়েছেন। কিন্তু সেজন্য ১৯৭২-৭৭ সাল পর্যন্ত যে কংগ্রেস 'সিপিএমের ১১০০ কর্মীকে হত্যা করেছিল' বলে সিপিএম নেতারাই বলে এসেছেন, সেই কংগ্রেসের সাথেই তাঁরা জোট বাঁধছেন!

শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের সাথে জোট করার সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য সিপিএম নেতারা এ রাজ্যে বিজেপি জুজুর ধুয়ো তুলতেও দ্বিধা করছেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে এ রাজ্যে প্রতিপক্ষ সাজিয়ে (গোপন বোঝাপড়ায়) বিজেপির জমি তৈরি করে দিতে তৎপর হয়েছেন। সিপিএম নেতারাও বলে চলেছেন, কংগ্রেসের সাথে জোট না করলে বিজেপি মাথা তুলত। এ কথার দ্বারা তাঁরাও যে বিজেপিকেই সুবিধা করে দিচ্ছেন, তা বোঝবার মতো রাজনৈতিক জ্ঞান সিপিএম নেতাদের অবশ্যই আছে। তবুও তাঁরা বিজেপির ধুয়ো তুলে যাচ্ছেন শুধুমাত্র কংগ্রেসের সাথে নিজেদের সুবিধাবাদী জোটকে দলের কর্মীদের কাছে গ্রহণীয় করার জন্য। কেন সিপিএমের এই পরিণতি?

এই রাজ্যে সিপিএম-ফ্রন্ট পর পর সাতবার বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে টানা ৩৪ বছর রাজত্ব করেছে। তাঁদের দলের কর্মীরা কি ভেবে দেখেছেন এত যাদের শক্তি ছিল, সেই শক্তি সংহত করে সংগঠন আরও বিস্তার করার কথা যে দলের, সেই দলের রাজ্য সম্পাদক ও পলিটব্যুরোর সদস্য সূর্যকান্তবাবুকে কেন এখন বলতে হচ্ছে কংগ্রেসের সাথে জোট না করলে তাঁরা ২৬টি আসনও পেতেন না। সংগঠনের এই অবস্থার জন্য কোথায় তাঁদের ত্রুটি ছিল তার অনুসন্ধান করা তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন কি? করলে তাঁরা দেখবেন সরকারি ক্ষমতায় থেকে দীর্ঘদিন গণআন্দোলনের পথকে পরিহার করার ফলে এবং যে কোনও ভাবে ক্ষমতায় থাকার যে চেষ্টা তাঁরা করে এসেছেন তার ফলে তাঁদের মধ্যে বামপন্থার মনোভাবই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে। একদিন বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর নেতা-কর্মীরা, পথ ঠিক বা ভুল যা-ই হোক না কেন, মানুষকে আন্দোলনের কথা শুনিয়েছেন, সাধারণ মানুষের আন্দোলনেও থেকেছেন। ১৯৭২ সালে কংগ্রেসের চরম সন্ত্রাস ও হত্যার রাজনীতিকে এস ইউ সি আই (সি) মোকাবিলা করেছে, সিপিএমকেও করতে হয়েছে। সেদিন কিন্তু লড়বার মন আজকের মতো ধ্বংস হয়ে যায়নি।

ক্ষমতায় আসার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে 'কমিউনিস্ট' দলের প্রতিনিধিরা ছুটে এসে সংসদীয় ব্যবস্থায় এত বছর কীভাবে সিপিএম ক্ষমতায় রয়েছে তা দেখে নাকি বিস্মিত হয়ে যেত! পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে তৃণমূল স্তরের জনগণের হাতে নাকি ক্ষমতা চলে গিয়েছিল এবং গণতন্ত্রের মজবুত ভিত নাকি তৈরি হয়েছিল! দলের যুব সংগঠনে, শ্রমিক সংগঠনে সদস্য সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে কোটির হিসাবে নাকি পৌঁছে গিয়েছিল! শুধু একবার মাত্র ভোটে হেরে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথে সেই তথাকথিত 'মার্কসবাদী সৈনিক'রা কোথায় গেল? ১৯৫০-এর দশক, '৬০-এর দশক, '৭০-এর দশকে যে আদর্শবাদ তাদের লড়াইয়ে প্রেরণা দিত, ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথে তার কেন আজ এত অভাব? এসব প্রশ্ন নিয়ে আশা করি তাদের কর্মীরা ভাববেন।

> মার্কসবাদের নাম নিয়ে প্রথমে সিপিআই এবং পরে সিপিএম এ রাজ্যে দ্রুত সংগঠনের বিস্তার ঘটিয়েছিল। বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারেও তারা গিয়েছিল। কিন্তু তাদের অমার্কসবাদী পথ, সুবিধাবাদী অবাম নীতির ফলে তাদের নেতারা এখন ক্ষমতা ছাড়া রাজনীতিতে আর কিছু বুঝতে চান না। ফলে পশ্চিমবাংলার এই দলভুক্ত বিপুল সংখ্যক মানুষের বামপন্থী মননটাই ধসে গিয়েছে বা যেতে বসেছে। তাদের শীর্ষস্তরের নেতাদেরও দক্ষিণপন্থী দলের সাথে হাত মেলাতে এতটুকু আটকাচ্ছে না। কর্মী-সমর্থকদের একটি অংশও সুবিধা পাওয়ার আশায় এদিক ওদিক ছুটছে।

তাঁদের ভাবতে হবে— ২০০৬ সালে ২৩৫-এমএলএ সংখ্যার ঔদ্ধত্য দেখিয়ে তাঁদের নেতৃত্ব যেভাবে বিরোধী মতামতকে চরম উপেক্ষা করেছিলেন তা কতটা গণতান্ত্রিক ও বামপন্থাসম্মত ছিল? ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যে কেশপুরে তাঁরা এক লক্ষ কুড়ি হাজার ভোট পেয়ে এক লক্ষ আট হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন সেখানে এবার কেন এক লক্ষ এক হাজার ভোটে হারতে হল? ক্যানিং পূর্ব, বীজপুর, আরামবাগ, গড়বেতা, গোঘাট সহ বহু আসনে যেখানে যত বিপুল ব্যবধানে তাঁরা জিততেন এখন সেখানে তত ব্যবধানেই হার হচ্ছে কেন? সেই ভোটগুলি কি ব্যাপক রিগিং-সন্ত্রাসের ফল ছিল না? বামপন্থা বর্জিত, রাজনীতি বিবর্জিত যে সমাজবিরোধী বাহিনীকে ব্যবহার করে তারা নির্বাচনে বিপুল জয় লাভ করেছিল, সিপিএম-এর সেই নেতাদের কাছে ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাহিনী এখন দল পাল্টে তৃণমূল কংগ্রেসের কাজে লাগছে! লক্ষণ শেঠ, রেজ্জাক মোল্লা, সুশান্ত ঘোষ, মজিদ মাস্টার, তপন-সুকুর সহ যারা ছিলেন সিপিএমের 'শক্তির প্রতীক', তারা কোন শক্তির প্রতিনিধি? এসব প্রশ্ন সিপিএমের নিষ্ঠাবান কর্মীরা একটু ভেবে দেখবেন।

সিপিএমের যে কর্মী-সমর্থকরা মনে করছেন, সরকারি ক্ষমতায় থাকার ফলেই নেতাদের এই অধঃপতন ঘটেছে, তাঁদের আমরা অতীত ইতিহাসটা একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বামপন্থী আদর্শ থেকে সিপিএম নেতৃত্বের বিচ্যুতি, বামপন্থী নৈতিকতা থেকে তাদের অধঃপতন শক্তির দম্ভে ও জৌলুসের ছটায় কর্মীদের নজরে পড়েনি। এ রাজ্যে ১৯৬০-এর দশকে যুক্তফ্রন্ট আমলে তাদের আচরণ দেখে মহান মার্কসবাদী দার্শনিক, আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন — "বিগত যুক্তফ্রন্টের সময়ে যখন তথাকথিত মার্কসবাদী লেনিনবাদী দল সিপিএমের শক্তি সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন তাদের কর্মী ও সমর্থকদের দাপটে দেশের মানুষ ছিল সন্ত্রস্ত। ... তাদের প্রভাবিত লোকজনদের মধ্যেই বেশি করে পুলিশ এবং প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিস্বার্থে অন্যায় সুযোগসুবিধা নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল, সামাজিক কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে 'ডিউটি' ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল, ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি আদর্শগত সহিষ্ণুতার মনোভাব গড়ে ওঠার পরিবর্তে অনুকূল পরিবেশে কাপুরুষোচিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার হীন প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। আর এই সবেরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই রাজ্যে শাসক কংগ্রেস সরকারি ক্ষমতা দখলের পর যখন তাদের পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হল তখন দেখা গেল ফ্রন্টের আমলের সেই 'দুর্দান্ত বিপ্লবী'দের টুঁ শব্দটি করার পর্যন্ত সাহস নেই। পুনরায় অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আবার হয়তো আপনারা দেখবেন তারা আগের সেই মূর্তিই পরিগ্রহ করেছে যার লক্ষণ ইতিমধ্যেই কিছু কিছু দেখা দিতে শুরু করেছে"(সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে;১৯৭৩ সালে ২৬ জুন প্রদত্ত ভাষণ)। প্রমাণিত হয়েছে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় ফিরে এসে তারা সেই মূর্তিই পরিগ্রহ করেছিল।

একদিন এই বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লববাদের জয়গান গেয়েছে। সেই পথে চলতে চলতে বাংলার মাটি হয়ে উঠেছিল বামপন্থীদের ঘাঁটি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ই কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থা-দক্ষিণপন্থার দ্বন্দ্বে বাংলায় দক্ষিণপন্থীরা জায়গা করতে পারেনি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের বিরাট জয়ের অনুকূল পরিস্থিতির প্রভাবে মার্কসবাদের নাম নিয়ে প্রথমে সিপিআই এবং পরে সিপিএম এ রাজ্যে দ্রুত সংগঠনের বিস্তার ঘটিয়েছিল। বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারেও তারা গিয়েছিল। কিন্তু তাদের অমার্কসবাদী পথ, সুবিধাবাদী অবাম নীতির ফলে তাদের নেতারা এখন ক্ষমতা ছাড়া রাজনীতিতে আর কিছু বুঝতে চান না। ফলে পশ্চিমবাংলার এই দলভুক্ত বিপুল সংখ্যক মানুষের বামপন্থী মননটাই ধসে গিয়েছে বা যেতে বসেছে। তাদের শীর্ষস্তরের নেতাদেরও দক্ষিণপন্থী দলের সাথে হাত মেলাতে এতটুকু আটকাচ্ছে না। কর্মী-সমর্থকদের একটি অংশও সুবিধা পাওয়ার আশায় এদিক ওদিক ছুটছে। এবার কংগ্রেসের সাথে জোট করে ক্ষমতায় গিয়ে সুবিধা পাওয়ার আশায় সিপিএম-এর সেই অংশটির তাদের নিজেদেরই পার্টি-কংগ্রেসের গৃহীত লাইন লঙ্ঘন করতে এবং কর্পোরেট হাউসের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দু'টি দল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ছয়টি বামপন্থী দলের যুক্ত আন্দোলনের যৌথ সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে এতটুকু বাধেনি। এখনও গণআন্দোলনের শত্রু কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে তাদের নেতারা একই আচরণ করে চলেছেন। এর দ্বারা রাজ্যে বা সারা দেশে গণআন্দোলন, বামপন্থা— কোনওটিই শক্তিশালী হবে না। বরং বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের পথ করবে, করছেও।

ফলে সিপিএম সহ অন্য সকল বামপন্থী দলের যে কর্মী-সমর্থকরা আজও সংগ্রামী বামপন্থাকেই ভবিষ্যৎ বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে আবেদন, প্রকৃত সংগ্রামী বামপন্থাকে চিনে নিয়ে তাকে শক্তিশালী করতে আপনারা উদ্যোগী হন। এটাই আজকের সময়ের আহ্বান।

হরিয়ানায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবিপত্র পেশ

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে হরিয়ানা সরকারের মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রীকে ২৩ জুলাই স্মারকলিপি দিল এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত কর্মী-সহায়িকা ইউনিয়ন। তাঁদের দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পানীয় জল, শৌচাগার ও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করতে হবে, উন্নত মানের শিশুখাদ্য সরবরাহ করতে হবে, ন্যূনতম বেতন ১৮ হাজার টাকা করতে হবে, অবসরকালে কর্মীদের ২ লাখ ও সহায়িকাদের ১ লাখ টাকা এককালীন অনুদান ও ৩ হাজার টাকা মাসিক পেনশন দিতে হবে, এই শিশুবিকাশ প্রকল্পকে বেসরকারি এন জি ও-র হাতে তুলে দেওয়া চলবে না প্রভৃতি।

কমসোমলের উদ্যোগে দেওয়াল পত্রিকা প্রদর্শনী

মহান মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১২৫ তম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে ঘরে ঘরে তাঁকে স্মরণ করার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২৪ জুলাই কলকাতার রাসবিহারী মোড়ে 'বিদ্যাসাগর স্মরণ অনুষ্ঠান ও দেওয়াল পত্রিকা প্রদর্শনীর' আয়োজন করা হয় কলকাতা জেলা কমসোমলের উদ্যোগে। বৃষ্টির মধ্যেও শতাধিক শিশু-কিশোর ১৯টি দেওয়াল পত্রিকা নিয়ে উপস্থিত ছিল। বিভিন্ন এলাকার কিশোর-কিশোরীরা তাদের সহপাঠী ও তার এলাকার শিশু-কিশোরদের আঁকা ছবি নিজেদের লেখা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ সংগ্রহ করে নিজস্ব উদ্যোগেই পত্রিকা তৈরি করেছে। তারা দেওয়ালে পত্রিকা লাগানো থেকে বিদ্যাসাগরের উপর রচিত গান, আবৃত্তি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে। একদিকে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো, অন্য দিকে মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোরদের মধ্যে সামাজিক মনন, মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা এবং সমাজপ্রগতির কাজে নিজেদের নিয়োগ করবার কাজে কমসোমল ব্রতী। ২৪ জুলাইয়ের প্রদর্শনী এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নেওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে দলের রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কমসোমলের প্রাক্তন রাজ্য ইনচার্জ অঞ্জনাভ চক্রবর্তী বিদ্যাসাগরের জীবনচর্চার তাৎপর্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

সি পি ডি আর এসের কর্মশালা

মানবাধিকার সংগঠন কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস অ্যান্ড সেক্যুলাররিজম (সিপিডিআরএস)-এর উদ্যোগে ১৭ জুলাই কলাকাতায় সারাদিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নারী-শিশু সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মানবাধিকার খর্ব করার ঘটনার বিরুদ্ধে করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনায়

অংশ নেন চিকিৎসক, আইনজীবী, অধ্যাপক, ছাত্র সহ ১১টি জেলার ২৫ জন কর্মী। উপস্থিত ছিলেন ৭০ জন কর্মী। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত, রাজ্য সভাপতি ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত, রাজ্য সহ সভাপতি সদানন্দ বাগল প্রমুখ সিপিডিআরএস-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির

২৩ জুলাই উত্তর কলকাতার লকগেট রোড পার্শ্বস্থ ঘোষবাগান অঞ্চলে পাবলিক রিলিফ সোসাইটি এবং চিৎপুর কবি সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও প্রাক্তন সংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন এম এস সি-র সহ সভাপতি ডাঃ ছোটন দাস, ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা সুনীল মোহিন্তা প্রমুখ। ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন কোনও কিছু পাওয়ার আশা না করে সামাজিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ ধরনের সেবামূলক কাজের জন্য ক্লাব ও সোসাইটির যৌথ প্রয়াস প্রশংসার যোগ্য। ডাঃ অনুপম ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক মেডিকেল টিম শিবিরটি পরিচালনা করে। শতাধিক মানুষ শিবিরে নিজেদের চিকিৎসা করান। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ডি ওয়াই ও-র কলকাতা জেলা সঙ্গীতগোষ্ঠী সঙ্গীত পরিবেশন করে। ক্লাবের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মণ্ডল সকলকে ধন্যবাদ জানান। (ছবি ঃ রোগীদের চিকিৎসা করছেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল)।

এ আই ডি ওয়াই ও-র নদিয়া জেলা সম্মেলন

বেকারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে অথচ কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই শূন্যপদগুলিতে নিয়োগ করছে না। সাম্প্রদায়িকতা এবং অপসংস্কৃতির জোয়ারে যুব সমাজকে ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে ১৭ জুলাই এ আই ডি ওয়াই ও-র নদিয়া জেলা পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বেথুয়াডহরিতে। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সম্পাদক কমরেড অঞ্জন মুখার্জী, মূল প্রস্তাবের সাথে অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, কল্যাণী শিল্পাঞ্চলের বন্ধ কল-কারখানা খোলা এবং নদিয়ার বীর বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের স্কুল জীবনের স্মৃতি বিজড়িত মোড়াগাছা স্টেশনের নাম এই বিপ্লবীর নামাঙ্কিত করা প্রসঙ্গে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সর্বহারা মুক্তিকামী মানুষের পথ প্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শের গভীর অনুশীলন এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যুবস্বার্থ বিরোধী নানা আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রধান বক্তা সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। জেলার ৪০টি গ্রাম-শহর থেকে প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

জেলা জুড়ে শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে কমরেড শীতল দে-কে সভাপতি ও কমরেড মসিকুর রহমানকে সম্পাদক করে ১৯ জনের জেলা কমিটি ও ২৫ জনের কাউন্সিল গঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদের সুতিতে ছাত্র সম্মেলন

১৭ জুলাই মুর্শিদাবাদের সুতিতে অনুষ্ঠিত হল এ আই ডি এস ও-র আঞ্চলিক সম্মেলন। বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। বক্তা ছিলেন কমরেড অনুপম পানি ও কমরেড ওহিরুজ্জামান। শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সুসজ্জিত মিছিল অরঙ্গাবাদ এলাকা পরিক্রমা করে এবং রাজ্য মেডিক্যাল জয়েন্ট তুলে দেওয়ার কালা সার্কুলারের প্রতিলিপি পোড়ায়। সম্মেলন থেকে গার্লস কলেজ স্থাপন, বিড়ি শ্রমিক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপের টাকা দ্বিগুণ পরিমাণে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে দেওয়া, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু, সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা সমাধান ও ভর্তি ফি বৃদ্ধি রোধ, নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রভৃতি দাবি ওঠে। সম্মেলনে ৫১ জনের কমিটি গঠিত হয়।

বালিচক স্টেশন উন্নয়ন কমিটির গণকনভেনশন

বালিচক উড়াল-পুল, প্রশস্ত বাসস্ট্যান্ড, যাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মাণ, স্টেশন উন্নয়নের সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ প্রভৃতি দাবিতে ২৩ জুলাই বালিচক স্টেশন উন্নয়ন কমিটির গণকনভেনশন হয়। সভাপতিত্ব করেন সভাপতি সুভাষচন্দ্র মাইতি। সমাজের বিভিন্ন অংশের, বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা বক্তব্য রাখেন। উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্দোলন সম্প্রসারিত ও তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে কমিটির নাম পরিবর্তন করে বালিচক উন্নয়ন কমিটি করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই কমিটির আন্দোলনের প্রতি এলাকাবাসীর গভীর আস্থা এই কনভেনশনে লক্ষ্য করা যায়।

এলাহাবাদে শ্রমজীবীদের আলোচনাসভা

এ আই ইউ টি ইউ সি-র এলাহাবাদ ইউনিটের উদ্যোগে ২৩ জুলাই এক আলোচনা সভা হয়। বিষয় ছিল, শ্রমিক আন্দোলনের আবশ্যিকতা ও শ্রমিকদের ভূমিকা। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিনহা। তা ছাড়া বক্তব্য রাখেন, এ আই সি সি টি ইউ-র ডাঃ কমল, সিটুর কমরেড হরিশচন্দ্র দ্বিবেদী, এ আই ইউ টি ইউ সি-র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিজয় পাল সিংহ, শিক্ষক নেতা বৃজেন্দ্র সিংহ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড কমলেশ সিংহ।

শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদ জন্মজয়ন্তী পালন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার মহান বিপ্লবী শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদের ১১১ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয় তাঁর জন্মস্থান মধ্যপ্রদেশের অলীরাজপুরের জোবট-এ। ২৪ জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা ছিল অল ইন্ডিয়া এম এস এস এবং আজাদ স্মৃতি মঞ্চ।

আমানতকারীর টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

অল বেঙ্গল চিটফান্ড ডিপোজিটর্স অ্যান্ড এজেন্টস ফোরামের আহ্বানে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জেলাশাসক দপ্তরে সহস্রাধিক আমানতকারী ও এজেন্ট বিক্ষোভ মিছিল করে গেলে পুলিশ পথ আটকায়, সেখানেই বিক্ষোভকারীরা প্রতিবাদ করেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন

সংগঠনের জেলা সভাপতি জাকির হোসেন, নকিবুদ্দিন সরকার ও কালোবরণ মণ্ডল। জেলা সম্পাদক আসরাফুল হকের নেতৃত্বে ৬ জনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেয়। জেলাশাসকের প্রতিনিধি আশ্বাস দেন, টাকা ফেরতের বিষয়ে রাজ্য সরকারকে জানানো হবে এবং এজেন্টদের সুরক্ষার বিষয়ে এস পি-র মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৬ জুলাই বসিরহাট রবীন্দ্র ভবনে ফোরামের দ্বিতীয় মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নিরেশ বৈদ সভাপতি ও গৌতম মণ্ডলকে সম্পাদক নির্বাচিত করে নতুন কমিটি গঠিত হয়। কমিটির পক্ষ থেকে ধারাবাহিক আন্দোলনের কথা ঘোষণা করা হয়।

পুরুলিয়ায় ডি এস ও-র আন্দোলনের জয়

রঘুনাথপুর, কাশীপুর ও বলরামপুর কলেজে প্রায় হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ না পেয়ে প্রবল সংকটে পড়েছে। এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে কলেজগুলির অধ্যক্ষদের কাছে ডেপুটেশন দিলেও কোনও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ২১ জুলাই রঘুনাথপুর মহকুমা শাসক ও ২২ জুলাই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডি এস ও-র নেতৃত্বে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে গিয়ে ডেপুটেশন দেয়। মহকুমা শাসকের প্রতিনিধি এবং রেজিস্ট্রার প্রায় প্রতিটি কলেজেই আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে আবেদনকারীদের ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

কুলতলিতে শিশু ধর্ষণে গ্রেপ্তার যুব তৃণমূল নেতা

সানকিজাহান কলোনির চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে তৃণমূলের স্থানীয় যুব নেতা ফণী দাস ধর্ষণ করে। ঘটনাটি কিছুদিন আগে ঘটলেও ভয়ে মেয়েটি তখন কাউকে কিছু জানায়নি। ২৫ জুলাই রাতে ওই লোকটিকে আবার পথে দেখতে পেয়েই সে ভয়ে কাঁদতে থাকে। তখনই বিষয়টি জানাজানি হয়। মেয়েটির বাবা-মা ওই দিনই কুলতলী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এলাকার মানুষের মধ্যে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ছে দেখে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

এই সংবাদ পেয়েই ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত করে চার্জশিট দেওয়া এবং এলাকায় মদ, জুয়া, সাট্টা বন্ধ করার দাবি নিয়ে ২৮ জুলাই কুলতলী থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়। মাত্র কয়েক ঘন্টার প্রস্তুতিতে চার শতাধিক মহিলা, যুবক ও ছাত্ররা এই বিক্ষোভে সামিল হন। মা-বোনেদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। বিক্ষোভসভা থেকে ওই গ্রামের ছ'জন প্রতিবাদী মহিলা সহ ন'জনের এক প্রতিনিধি দল এ আই এম এস এসের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদিকা কমরেড মাধবী প্রামাণিক ও সংগঠনের কুলতলী ব্লক শাখার ইনচার্জ কমরেড সীমা পণ্ডার নেতৃত্বে উল্লিখিত দাবি সংবলিত স্মারকলিপি নিয়ে ও সি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ও সি দাবিগুলি মেনে নিয়ে সব রকমের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

প্রতিনিধি দল ফিরে এলে কমরেড মাধবী প্রামাণিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হলে আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বিক্ষোভ সভায় এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য এবং কুলতলীর প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারও বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, এই ধরনের অমানবিক ঘটনা বেড়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে মদের ব্যাপক প্রসার। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে, এই দাবিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তাঁরা।

গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স থেকে

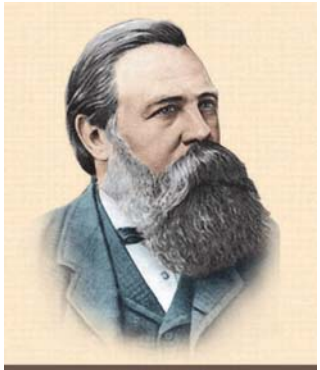

সমাজতন্ত্র ঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

৫ আগস্ট রানি রাসমণি অ্যাভেনিউর সভায় বুক স্টলে পাওয়া যাবে

সব সরকারই কাশ্মীরের জনগণকে শত্রু ভাবছে

একের পাতার পর

সে ফেসবুক-এর মাধ্যমে কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিত। তার বিরুদ্ধে সরকার উগ্রপন্থার অভিযোগ আনলেও অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের নির্ভয়ে তীর্থ করতে কাশ্মীরে আসার আহ্বান জানায় ওয়ানি তার সর্বশেষ পোস্টে। নিরাপত্তায় কী বিঘ্ন ঘটানোর জন্য সেই ওয়ানিকে হত্যা করল সামরিক বাহিনী সেই প্রশ্নে উত্তাল হয়ে উঠেছে উপত্যকা।

এই হত্যার ঘটনার অভিঘাত চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। প্রায় দুই লক্ষ মানুষ বুরহানের শেষযাত্রায় অংশ নেয়। তারপর থেকে প্রতিদিন কাশ্মীরের ১০টি জেলা জুড়ে হাজার হাজার মানুষের অহরহ বিক্ষোভ চলতেই থাকে। সাধারণ নাগরিকদের সাথে পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষ চলছেই। ১০ জেলাতেই কার্ফু জারি হয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত বন্ধ। স্তব্ধ গোটা উপত্যকা যেন যুদ্ধক্ষেত্র। এখনও পর্যন্ত ৪৯ জন নিহত হয়েছে পুলিশ এবং সামরিক-আধা সামরিক বাহিনীর হাতে। আহত হয়েছে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার মানুষ। কাশ্মীরের সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. কয়সার আহমেদ-এর বয়ান অনুযায়ী ৯ জুলাই থেকে পেলেট বুলেটে আহত ২৮০ জনের চিকিৎসার অফিসিয়াল হিসাব আছে। এদের মধ্যে পেলেট বুলেটে চোখ নষ্ট হয়ে গেছে ৫৩ জনের।

মেহেবুবা মুফতির নেতৃত্বে পিডিপি-বিজেপি জোট সরকার এই ঘটনাপ্রবাহের খবর চাপতে সংবাদপত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেয়। পত্রিকার দপ্তরে রাতের অন্ধকারে পুলিশ পাঠিয়ে প্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করে কাগজ ছাপা বন্ধ করে দেয় মেহেবুবা সরকার। উপত্যকায় পাঁচ দিন কোনও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। মোবাইল, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বভাবতই সর্বত্র প্রতিবাদ ওঠে। সরকারও বুঝতে পারে যে এর ফলে হিতে বিপরীত হবে। নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয় তারা।

সামরিক বাহিনীর হাতে বুরহানের মৃত্যু উপত্যকায় যে অভাবনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তার বীজ কোথায় নিহিত আছে তা ভেবে দেখতে হবে। লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি কেন বুরহানের মৃত্যুতে এমন উত্তাল হয়ে উঠল? সেনা, আধা-সেনা, পুলিশ দিয়ে দমন পীড়ন, হত্যা চালালেও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ এখনও থামার কোনও লক্ষণ নেই। কেন?

সংসদের ঠাণ্ডা ঘরে বসে বিতর্ক, বিবৃতির কচকচানি চলছে। বিক্ষোভ দমনে সেনাদের পেলেট ব্যবহারে বিক্ষোভকারীদের শরীরের ঊর্ধ্বাংশ যেভাবে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তাতে অবিলম্বে এর ব্যবহার বন্ধের দাবি উঠলেও বিজেপি নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি কমিটি গঠন করে বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত দিয়েছেন। বিজেপি তার হিন্দুত্ববাদী, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তিতে গোটা দেশ শাসন করতে চায়। তাই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর উপত্যকার বিক্ষোভ তার রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে কাজে লাগে। ভারত এবং পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্রই জনগণের সামনে কাশ্মীর সমস্যাকে জুজু হিসাবে দেখিয়ে আসছে। কাশ্মীরকে সামনে রেখে দুই দেশই তাদের যুদ্ধ বাজেট বাড়ায়। দুই দেশের জনগণকে একে অপরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে রাখতে কাশ্মীর সমস্যাকে ব্যবহার করতে সিদ্ধহস্ত ভারত পাকিস্তান দুই দেশের শাসকরাই। কাশ্মীর বাদে দেশের বাকি অংশে এই নিয়ে বিজেপি তার ভুয়ো জাতীয়তাবাদের রাজনীতি করছে। এ ব্যাপারে কংগ্রেসও পিছিয়ে নেই।

আবার, যে কংগ্রেস বিজেপি-র বিরুদ্ধে অস্ত্র শানিয়ে বিরোধী রাজনীতির পরিসর দখল করতে উঠে পড়ে লেগেছে, কাশ্মীর নিয়ে যাদের দরদ উথলে উঠছে, তাদেরই শাসনে ২০১০ সালে সেনার হাতে পেলেট বন্দুক তুলে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক যেমন কেন্দ্রের গদিতে থাকা অবস্থায় ১৯৯০ সালে সেনার হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিতে কংগ্রেস এই রাজ্যে 'আফস্পা' চালু করে। যা আজও পর্যন্ত বলবৎ। এর মধ্যে ইউপিএ, এনডিএ, তৃতীয় ফ্রন্ট ইত্যাদি প্রায় সব সংসদীয় দলের নানা রঙের জোট কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে গেছে। আফস্পা সহ নানা কালা কানুন জারি রেখে উপত্যকার মানুষের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করে এরা সকলেই কাশ্মীর সমস্যাকে শুধু জিইয়ে রেখেছে নয়, তাকে আরও ভয়াবহ আকার দিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সাহায্য করছে।

কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম কাশ্মীরকে আরও বেশি স্বশাসন দেওয়ার কথা বলেছেন। সেনা দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না বলে তথাকথিত অনেক ভাল কথা বলেছেন। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে চিদাম্বরম এবং তার সাথীরা এই কথাগুলি একবারও বলেননি। ৩৭০ ধারা যতটুকু স্বশাসনের অধিকার দিয়েছে সেটাও চালু করেননি। আজ হঠাৎ এসব কথা বলছেন বিরোধী অবস্থানে আছেন বলেই। তার দল কংগ্রেস অবশ্য অন্য কথা বলেছে।

সেই নেহেরুর আমল থেকেই ধীরে ধীরে কাশ্মীরের মানুষ নানা ভাবে তার যথার্থ রাজনৈতিক অধিকার হারিয়েছে। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার তার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদটিকে নামিয়ে এনেছে মুখ্যমন্ত্রীর পদে। রাজ্যের প্রধান সদর-ই-রিয়াসৎ পদটিকে তুলে দিয়ে কেন্দ্রের মনোনীত রাজ্যপাল পদ সৃষ্টি করেছে। যে স্বাধীন কাশ্মীর রাজ্য স্বেচ্ছায় নিজেদের ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছে, ইচ্ছা করলেই তারা পাকিস্তানের সাথে যেতে পারত, কিন্তু যায়নি। সেই কাশ্মীরের মানুষকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসবাদী তকমা আঁটা হয়ে চলেছে। তাদের মর্যাদাবোধে ক্রমাগত আঘাত করা হয়েছে। এখানে কোনও শিল্পের বিকাশ ঘটানো হয়নি। মানুষের রুটি রুজির বন্দোবস্ত করতে সরকার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অথচ প্রাকৃতিক, খনিজ সম্পদে ভরপুর ভূস্বর্গ। পর্যটন শিল্পের বিকাশও ঘটানো হয়নি। উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল গড়ে তুলতে কেন্দ্রের উদ্যোগ কতটুকু?

পাশাপাশি কংগ্রেস সরকার কাশ্মীরের জনগণের উপর তাদের পেটোয়া শক্তির শাসন জারি রাখতে আশির দশকের শেষে ব্যাপকহারে নির্লজ্জ রিগিংকে হাতিয়ার করে উপত্যকার তৎকালীন রাজনৈতিক শক্তিকে নির্বাচনে পরাজিত করে। ভারত সরকারের প্রতি সেখানকার মানুষের আস্থা বা বিশ্বাস সেই যে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল আজ তা প্রায় শূন্যে। জনগণের মধ্যে যে হতাশা ও ক্ষোভ জন্ম নিল তাকে কাজে লাগাতে উপত্যকার মুসলিম মৌলবাদী শক্তি, প্রতিবেশী দেশের সন্ত্রাসবাদী শক্তি তৎপর হয়। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ না নিয়ে সেনাবাহিনীকে যথেচ্ছ ক্ষমতা দিয়ে যে নৃশংসতা কাশ্মীরবাসীর উপর নামিয়ে আনা হল তা এখানকার মানুষকে আরও নিরাপত্তাহীনতা, বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে ভারতীয় সেনা, নিরাপত্তাবাহিনী, প্রশাসন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করেছে।

এই প্রজন্মের কাশ্মীরি যুবকরা, যারাই মূলত সেনা, আধা-সেনার সাথে খালি হাতে লড়ছে, তারা প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিপীড়নের চেহারা প্রত্যক্ষ করে আসছে। কাশ্মীরের প্রতিটি শহর, গ্রাম, প্রধান সড়ক, গলি, গ্রাম্য রাস্তা, এমনকী বাড়ির উঠোনেও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি, নিশ্ছিদ্র নজরদারির মধ্যে তারা বড় হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পরিবার আছে, যাদের কোনও না কোনও সদস্য সেনার হাতে নিগৃহীত হয়েছে। গত আড়াই দশকে উপত্যকার প্রায় ৮ হাজার মানুষ স্রেফ উধাও হয়ে গেছেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। ভুয়ো সংঘর্ষে প্রাণ গেছে কত শত নিরীহ মানুষের। মনে রাখা দরকার সন্ত্রাসবাদীরা ব্যাপক জনগণের তুলনায় নিতান্তই সংখ্যালঘু। নইলে সন্ত্রাসের পথ নিতেই হত না। যে বুরহান ওয়ানির হত্যা নিয়ে আজ রাজ্য উত্তাল, সেই ওয়ানির বড়ভাই খালিদ, যে সন্ত্রাসবাদী ছিল না, তাকেও নিরস্ত্র অবস্থায় সেনারা পিটিয়ে হত্যা করেছে ২০১৫ সালে। এরা কিন্তু কেউই পাকিস্তানের সমর্থকও ছিল না।

কাশ্মীরের যে কোনও ঘটনায় পাকিস্তানের মদত আছে ধরে নেওয়া সমস্যা থেকে গা বাঁচানোর উপায় হতে পারে। তাতে সমাধানের কোনও রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু কাশ্মীর নয়, সারা দেশেই সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি, সে মুসলিম বা হিন্দু যে গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদই হোক না কেন, সেই রাজনীতিকে অবশ্যই নিন্দা করতে হবে। বিদেশি উগ্রপন্থীদের অনুপ্রবেশকেও রুখতে হবে। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কাশ্মীরে আজ পর্যন্ত যা ঘটে চলেছে তাতে প্রকৃত সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বার করার দিকে যথেষ্ট নজর না দিয়ে যে কোনও প্রতিবাদীকে সহজ শিকার বানানো হচ্ছে। সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, সেনা অত্যাচার, ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মানে কি সন্ত্রাসবাদী, রাষ্ট্রবিরোধী হয়ে যাওয়া? অথচ এই তকমা লাগানো চলছে নির্বিচারে। সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনের নামে যথেচ্ছ অত্যাচার, হত্যা, ভুয়ো সংঘর্ষে মৃত্যু মিছিল চলছেই। ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনও রাষ্ট্রীয় পীড়নের প্রতিবাদে সশস্ত্র রূপ নিতে পারে। তার দ্বারাই সেটা রাষ্ট্রবিরোধী বিদ্রোহ হয়ে যায় না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনই থাকে।

কাশ্মীরের জনগণ কিন্তু ভারতের অন্যান্য অংশের মানুষের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব পোষণ করেন না। বরং তাঁরা অতিথিপরায়ণ, বাইরে থেকে যাওয়া পর্যটকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তা বোঝেন। এই পরিস্থিতিতে তাদেরকেও পরিষ্কার করে একটি কথা বুঝতে হবে। কাশ্মীরের জনগণ যেমন দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র, বেরোজগারি, অশিক্ষা, অচিকিৎসা সহ নানা আর্থিক শোষণে জর্জরিত, সারা দেশের মানুষের সামনেও সমস্যার চেহারা একই। দেশের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ জেরবার হয়ে যাচ্ছে তাদের জীবন যন্ত্রণায়। কাশ্মীরের জনগণ এর সাথে রাষ্ট্রের নিপীড়নে রক্তাক্ত। তাই সারা দেশের মানুষের লড়াইয়ের সাথে উপত্যকার জনগণের ঐক্যবদ্ধ, একাত্ম লড়াই জরুরি।

প্রশ্ন হল, সমগ্র কাশ্মীরকে ভারতবিদ্বেষী তকমা না লাগিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের সদিচ্ছা দেখাচ্ছে কি সরকার? তাহলে সবচেয়ে আগে প্রতিটি বেসামরিক এলাকা থেকে সামরিক-আধা সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। আফস্পা সহ প্রতিটি দমনমূলক কালা কানুন প্রত্যাহার করতে হবে। তার ভিত্তিতে আলোচনার টেবিলে সরকারকে বসতে হবে। গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকারকে মর্যাদা দিতে হবে।

এখনও টাকা পায়নি জঙ্গলমহলের ৬ হাজার চাষি

একের পাতার পর

সর্বনাশ ডেকে আনছে চাষির ঘরে ঘরে? প্রচার করা হয়েছিল সরকারি সহায়ক মূল্যে সব বিক্রেতার ধান কিনে নেওয়া হবে। সরকারি প্রচারে বিশ্বাস করবেই তো চাষিরা। কিন্তু এই সমস্ত গোলায় সরকারি আধিকারিক ও পঞ্চায়েতের উপস্থিতিতেই কুইন্টাল প্রতি ৮-১০ কেজি ধান বাড়তি আদায় করা হয়েছে চাষিদের কাছ থেকে 'শুকতি' কিংবা এই ধরনের কোনও না কোনও অজুহাত তুলে। তার পরেও দাম পাওয়ার বিষয়ে কত হয়রানি।

জেলাতে ধান কেনার দায়িত্বে ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল এসেনসিয়াল কমোডিটি সাপ্লাই কর্পোরেশন। এ ছাড়াও ছিল বেনফেড, কনফেড, নাফেড সহ বিভিন্ন কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি। ঝাড়গ্রাম মহকুমার একের পর এক ব্লকের ঘটনা হল, ধান কিনে যে চেক দেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্কে তা বাউন্স হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এই খাতে সরকার কোনও টাকা রাখেনি। কৃষি সমবায় সমিতি সাধারণ রসিদ দিয়ে ধান কিনে নিয়েছে তার টাকার হদিশ এখনও নেই। ফেব্রুয়ারিতে ধান কিনেছে বেলিয়াবেড়া থানার পাইক আম্বি এবং বনডাহি এস কে ইউ এস-এর প্রতিনিধি প্রশান্ত খান। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্যরা। কিন্তু একটি টাকাও পায়নি চাষিরা। লালগড় ব্লকের কেবল ধরমপুর পঞ্চায়েতে এমনি করে কেনা হয়েছিল ১৩০০ কুইন্টাল ধান, যার দাম প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। একটি টাকারও দেখা নেই। ব্লকের পর ব্লকে এই ধরনের হাজারের বেশি চাষির পাওনা আটকে আছে। কমপক্ষে যা দেড় কোটি টাকার উপর। মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে। টাকা দেওয়া হচ্ছে না, দরিদ্র পরিবারগুলির সংসার কীভাবে চলছে তার হদিশ নেওয়ার কোনও দপ্তর কিংবা কোনও পঞ্চায়েত নেই। টাকা না পাওয়ার ফলে চাষিরা চাষের কাজে মাঠে নামতেই পারছে না। তাদের চোখে জল। লালগড় ব্লকের ৬২ জন চাষির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা খাদ্যদপ্তরে এখন একটু নড়াচড়া শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ব্লকের ক্ষুব্ধ চাষিরা বিডিও এবং ঝাড়গ্রাম মহকুমা শাসকের কাছেও অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে অবিলম্বে সুরাহার দাবি জানিয়েছেন।

অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের প্রাপ্য টাকা সুদ সহ মিটিয়ে দেওয়া এবং এই হয়রানির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতির নেতৃত্বে ২১ জুলাই জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন এড়াতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যাটিউট তৈরি হচ্ছে না

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য সুগত মারজিত তাঁর কার্যকালের মেয়াদের শেষ দিনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে 'আক্ষেপ' করে বলেছেন, "বিধিটা তৈরি হয়ে যাওয়া খুব প্রয়োজন ছিল। অনেক কিছুই নির্ভর করে ওই বিধির উপর" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫.০৭.২০১৬)। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি বা স্ট্যাটিউট প্রসঙ্গেই যে তিনি এ কথা বলেছেন তা পরিষ্কার। কিন্তু তাঁর আক্ষেপটা কার কাছে, তা বোঝা গেল না। বিধি তৈরি না হওয়ার দায় তো তাঁর নিজের — দীর্ঘ এক বছর উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের পরও তিনি ওই 'খুব প্রয়োজনীয়' কাজটি করলেন না কেন? হঠাৎ শেষ দিনেই বা তাঁর বোধোদয় হল কেন? তাঁর নিজের কথা অনুযায়ী তিনি তো 'সরকারেরই লোক' ছিলেন, তা হলে এই কাজে বাধাটা তিনি কোথায় পেলেন তা খোলাখুলি বলে গেলেন না কেন? প্রশ্ন উঠছে শিক্ষক-শিক্ষাবিদ মহলে।

বিধি বা স্ট্যাটিউট কী

কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কেমন করে চলবে তার জন্য আইন থাকে, যা প্রণয়ন করে রাজ্য বিধানসভা। সরকারি যে কোনও আইনের মতোই এই আইন কেমন করে কার্যকরী হবে তার জন্য প্রণীত হয় বিধি। বিধি প্রণয়ন করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রস্তুত বিধির খসড়া রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের আইন বিভাগ ঘুরে শেষপর্যন্ত রাজ্যপাল তথা আচার্যের অনুমোদনের জন্য রাজভবনে যায়। কী থাকে এই বিধিতে? অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক সংস্থাগুলিতে শিক্ষক, ছাত্র বা আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধি নির্বাচন কেমন করে হবে তা এই বিধিতেই লেখা থাকে। বিধি প্রণীত না হওয়ায় এই নির্বাচন প্রক্রিয়া ২০১১ সালের পর থেকেই রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বন্ধ হয়ে আছে। তার ফলে তৃণমূল জমানায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রশাসন চলছে মনোনীত সরকারি আমলা ও পদাধিকার বলে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই — গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির কোনও স্থান নেই। নির্বাচন এড়িয়ে যাওয়াই বিধি প্রণয়ন না করার পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

পূর্বতন সিপিএম সরকার যেমন নগ্নভাবে শিক্ষায় দলতন্ত্র কায়েম করেছিল, ক্ষমতায় এসে তৃণমূলও সেই একই পথে হাঁটতে শুরু করে। ২০১১ ও ২০১২ সালে তারা পরপর তিনবার রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন করে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করার জন্য যে সংস্থাগুলি থাকে তার মধ্যে মুখ্য হল কোর্ট-কাউন্সিল বা সেনেট-সিন্ডিকেট। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক যুগ থেকে রেনেসাঁস ব্যক্তিত্বরা বারবার দাবি করে এসেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-গবেষক-ছাত্র-আধিকারিক-শিক্ষাকর্মীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর— সেখানে সরকারের নাক গলানোর কোনও অধিকার থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। কিন্তু সেই অজুহাতে কখনওই প্রশাসনে শাসক দলের বা সরকারি হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার বর্তাবে না। গণতন্ত্র অনুযায়ী, এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের যথার্থ ধারণা।

এই ধারণা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। সামন্ততন্ত্রের যুগে রাজা, সামন্তপ্রভু ও চার্চ যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ জোগাত, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাচর্চাও রাজার অঙ্গুলিহেলনে চলত। দেশে দেশে চার্চের প্রভাব থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রেনেসাঁস আন্দোলনের পথিকৃতদের বহু সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। দীর্ঘ এই লড়াইয়ের পটভূমিতে শিক্ষা পরিচালনার উক্ত গণতান্ত্রিক ধারণার জন্ম হয়। আমাদের দেশেও স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক ও সার্বজনীন করার প্রয়োজনে এই লড়াই পরিচালনা করতে হয়েছিল। বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, স্বাধীনতার পর যখন শিক্ষাকে সর্বজনীন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালন সংস্থাগুলি আরও গণতান্ত্রিক তথা আরও প্রতিনিধিত্বমূলক করা জরুরি ছিল, তখন কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলি তাকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছে, বারবার আইন সংশোধন করে কোর্ট-কাউন্সিল বা সেনেট-সিন্ডিকেটে নির্বাচিত শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-গবেষক-ছাত্র প্রভৃতির সংখ্যা হ্রাস করেছে এবং বিপরীতে মনোনীত সরকারি আমলা ও পদাধিকারী সদস্যে ভরিয়ে দিয়েছে, ডান-বাম নানা কিসিমের শাসক দল ইচ্ছামতো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করেছে। এ সবই তারা করেছে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে। কারণ পুঁজিবাদ যত সংকটগ্রস্ত হয়েছে তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে শিক্ষাকে সংকোচন করার, পঠন-পাঠনের বিষয়বস্তুকে বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ করার পরিবর্তে অন্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন-মধ্যযুগীয় ভাবনা-ধারণার বাহক হিসাবে গড়ে তোলার। শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-ছাত্র সহ গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব শিক্ষা পরিচালনায় নিযুক্ত হলে এই কাজ যে অসুবিধাজনক তা পুঁজিবাদের সেবাদাস এই দলগুলির বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ক্ষমতাসীন সমস্ত দলগুলি তাই এই কাজে নিজেদের যুক্ত করেছে —রাজ্যের বর্তমান শাসক দলটি তার ব্যতিক্রম নয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১১-'১২ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের যতটুকু সুযোগ ছিল, এই সরকার তার সংখ্যা অনেকটাই কমিয়ে দেয়। কমিয়ে দেওয়ার কাজটি শুরু করেছিল এই রাজ্যে সিপিএম এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস ও পরবর্তীকালে বিজেপি। সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের শেষের দিকে যে যে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল তার কোনওটিতেই, যেমন পঃ বঃ হেলথ সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটিতে, কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের সুযোগই ছিল না। সমস্ত পরিচালন সংস্থাগুলি ছিল মনোনীত সদস্যে পরিপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে তৃণমূল যা করল তা এক কথায় নজিরবিহীন। প্রথমত আগের তুলনায় নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা কমিয়ে দিল, দ্বিতীয়ত খাতায়-কলমে যে সংখ্যা রইল সেই সংখ্যক প্রতিনিধিও যাতে নির্বাচিত না হয়ে আসতে পারে—অর্থাৎ নির্বাচনটাই যাতে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, চালাকি করে সেই ব্যবস্থাই করল সংশোধিত আইনের বিধি বা স্ট্যাটিউট প্রণয়ন না করে। কারণ স্ট্যাটিউট ছাড়া নির্বাচন হয় না। এ ঘটনা কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে তাই নয়, রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রটা একই। কোথাও স্ট্যাটিউট প্রণীত হয়নি এবং সেই অজুহাতে কোথাও কোর্ট-কাউন্সিল বা সেনেট-সিন্ডিকেট নির্বাচন হয়নি। ফলে সকল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সংস্থাগুলিতে কেবল সরকারি লোক গিজগিজ করছে। আর তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রীর দাম্ভিক উক্তি 'টাকা দিই, তাই নাক গলাব' অথবা 'শিক্ষকদের আচরণবিধি তৈরি করব', ইত্যাদি— যা আসলে স্বাধিকারে হস্তক্ষেপের নামান্তর। সকল শিক্ষাপ্রেমী মানুষের এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আজ খুবই জরুরি।

ডি এস ও-র উদ্যোগে আলোচনা চক্র

শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার সংগ্রামকে সংহত করার আহ্বান জানিয়ে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৩-২৪ জুলাই দু'দিন ব্যাপী আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হল নারায়ণগড়ে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পটি নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কমল সাঁই। অন্যতম আলোচক রাজ্য সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায় ২২-২৪ সেপ্টেম্বর ছাত্র মহামিছিল ও রাজ্য সম্মেলন এবং ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লি অভিযানে সবাইকে সামিল হওয়ার আবেদন জানান।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিকে অভিনন্দন জানান এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি। নেতাজি-ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিংদের যথার্থ উত্তরসূরি হিসাবে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সবাইকে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

গান, আবৃত্তি, মূকাভিনয়, ক্যারাটে, কুচকাওয়াজ, কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিপ্লবী তত্ত্ব শিখতে হবে

একের পাতার পর

শিখতেই হয়, বিপ্লবী তত্ত্ব যদি আয়ত্ত করতেই হয়, তাহলে তেমন নেতা এবং তেমন দলের কাছ থেকেই শিখবেন যাদের কর্মী ও নেতাদের জীবনটাও বিপ্লবীর মতো। যাদের বুকনিটা শুধু বিপ্লবের, কিন্তু জীবনটা পেটিবুর্জোয়ার বা বুর্জোয়ার মতো, যারা ক্লাস নেয় বিপ্লবের, অথচ যাদের আচরণ, রুচি এবং সামাজিক সম্পর্কের ধরনগুলো বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত, ব্যক্তিগত জীবনের নানা ব্যাপারে আচরণের ক্ষেত্রে যাদের মার্কসবাদী দর্শনগত চিন্তার সাথে কোনও সামঞ্জস্য নেই এবং সেই অনুযায়ী পরিচালিত নয়, অন্তত তেমনভাবে পরিচালনা করার জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা সংগ্রাম চালাতে চাইছে না, তেমন বুকনিসর্বস্ব বিপ্লবীদের কাছ থেকে আমার অনুরোধ আপনারা অন্তত বিপ্লবের তত্ত্ব এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখবেন না। এই ধরনের নেতাদের থেকে আপনারা যত দূরে থাকেন, তাদের গরম গরম বিপ্লবের বুলি থেকে আপনারা যত দূরে থাকেন, তত সত্যিকারের বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে মঙ্গল এবং আপনাদের পক্ষেও মঙ্গল।

আপনাদের মনে রাখা দরকার, কমিউনিস্ট হওয়ার সাধনা একটি কঠিন সাধনা। এই বিপ্লবী রাজনীতি হচ্ছে একটা সর্বব্যাপক আন্দোলন যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোকে 'ইন্টিগ্রেট' করে, অর্থাৎ সংযোজিত করে গড়ে ওঠে। এই 'ইন্টিগ্রেশনটি' ঘটাতে পারলে তবেই সর্বহারা বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। তা না হলে হাজার লড়ালড়ির মধ্যেও শেষ পর্যন্ত শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতার অভ্যুত্থান এবং সংগ্রামের হাতিয়ার জনতার নিজস্ব বিপ্লবী সংগঠনগুলো গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনে নেতাদের তো বটেই, এমনকী কর্মীদেরও সাধনার বিষয়বস্তু হচ্ছে সমস্ত জীবনকে ব্যাপ্ত করেই এই বিপ্লবের প্রক্রিয়াটা গড়ে তুলতে হবে। এই সংগ্রাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে— ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন, এমনকী যৌনতা-ভালোবাসা পর্যন্ত— সমস্ত কিছু ব্যাপ্ত করেই কমিউনিস্ট হওয়ার এই মহান সংগ্রাম।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা বর্তমান সমাজে যে ন্যায়নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ বা যে মূল্যবোধের দ্বারা আজও পরিচালিত হই, মনে রাখতে হবে, সে সবগুলোই বুর্জোয়া নৈতিকতার ধারণা এবং এই নৈতিকতাগুলোর পরিবর্তে কমিউনিস্ট নৈতিকতাবোধ গড়ে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত সচেতন সংগ্রামের দ্বারাই, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সর্বহারা শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি যাকে আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলি তা গড়ে তোলার বিরামহীন সঠিক সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র আমরা নিজেদের কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তুলতে পারি। এই সংগ্রাম পার্টির অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত একটি জীবন্ত সংগ্রামের রূপ নেওয়া দরকার এবং পার্টির বাইরেও এই আদর্শ এবং সংস্কৃতিগত ক্রান্তি যা আমাদের দেশের বিপ্লবের পরিপূরক মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, তার আন্দোলন সাথে সাথে গড়ে তোলা দরকার। এখানে একটা কথা সবসময়ই মনে রাখা দরকার যে, এককভাবে দলের বাইরে থেকে এই সংগ্রাম পরিচালনা করা কখনই সম্ভব নয়, যৌথ সংগ্রামই হচ্ছে এর একমাত্র গ্যারান্টি।

এখন বিচার করে দেখা যাক, আমরা মার্কসবাদী দর্শনকে আমাদের জীবনদর্শন হিসাবে মেনে নেওয়ার সাথে সাথেই কি আমরা কমিউনিস্ট হয়ে যাই? লেনিন বলেছেন— না, তার দ্বারা আমরা কমিউনিস্ট হওয়ার ইচ্ছাকে প্রকাশ করি মাত্র। যে সংগ্রামটির কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, পার্টির অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট হওয়ার যে বিরামহীন সংগ্রাম তার কাছে নিজেকে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করে সচেতনভাবে সে সংগ্রামটি পরিচালনা না করলে কিছুতেই কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। অথচ কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা কমিউনিস্ট হওয়ার এই মূল সংগ্রামটি এড়িয়ে গিয়ে পার্টি গঠনের চেষ্টা করেছেন। ফলে পার্টি নেতৃত্ব যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির গুণসম্পন্ন একটি যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দেবার পরিবর্তে আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে পর্যবসিত হয়েছে এবং পার্টিকে তাঁরা একটি গণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টির পরিবর্তে সাধারণভাবে গৃহীত রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক গ্রুপগুলির একত্র সংগ্রামের একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত করেছেন।

(কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল)

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

বিদ্যুৎভবনে পক্ষকাল ধরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

অ্যাবেকার নেতৃত্বে কলকাতায় বিদ্যুৎ ভবনের সামনে পক্ষকালব্যাপী বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ শেষ হল ২৬ জুলাই। শেষ দিনে হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা এবং নদিয়া জেলার শত শত বিদ্যুৎগ্রাহক এসেছিলেন বিক্ষোভ জানাতে। তাঁরা মিছিল করে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে এলে অন্যান্য দিনের মতোই বিশাল পুলিশবাহিনী তাঁদের বাধা দেয়।

সেখানেই শুরু হয় বিক্ষোভ সভা। হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক মণিমোহন ঘোষ স্মারকলিপি পড়ে বলেন, মাশুল বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে অথচ গ্রাহকরা পরিষেবা পাবেন না, এটা চলতে পারে না। তিনি বলেন, হুগলি সহ রাজ্যের সব জেলাতেই লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ চলছে, সাব-স্টেশন নেই, ট্রান্সফরমার নেই, বাঁশের খুঁটিতে বিপজ্জনকভাবে তার টানা চলছে, ফিউজ কল চার্জের নামে হাজার হাজার টাকার ভুতুড়ে বিল পাঠানো হচ্ছে। মিটার নেই, মিটার রিডিং-এর ব্যবস্থা নেই, অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এক অরাজক অবস্থা চলছে। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী বলেন, বিদ্যুৎ মাশুল কমাতে হবে। দিল্লি, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য যা পারে পশ্চিমবাংলা তা পারবে না কেন?

ডাইরেক্টর (ডিস্ট্রিবিউশন)-এর সাথে আলোচনা শেষে অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস বিক্ষোভকারীদের জানান, কর্তৃপক্ষ বলেছে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। আমরা ১৫ দিন অপেক্ষা করব। এর মধ্যে কাজ না হলে প্রতিরোধ আন্দোলন করা হবে। আপনারা ফিরে গিয়ে সেই আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তুলুন।

জনজীবনের নানা দাবিতে ঝাড়খণ্ডে বিক্ষোভ

মদ নিষিদ্ধ করা, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অশ্লীল সিনেমা, সাহিত্য বন্ধ করা, স্কুলে ফি-বৃদ্ধি বন্ধ করা, সকলের জন্য রেশন কার্ড প্রভৃতি দাবিতে ২৭ জুলাই এস ইউ সি আই (সি) পূর্ব সিংভূম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা আধিকারিকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জামশেদপুর, চাকুলিয়া, ধলভূমগড়, ঘাটশিলা, পোটকা, ডুমরিয়া থেকে বহু মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। জেলা সম্পাদক কমরেড বিমল দাসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল দাবিপত্র পেশ করেন।

হরিয়ানায় শহিদ উধম সিংহ দিবস পালন

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার মহান বিপ্লবী উধম সিংহের শহিদ দিবসে ৩১ জুলাই অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে ভিওয়ানির নেহরু পার্কে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে ই এইচ ডায়ারের নির্দেশে সংঘটিত গণহত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন শিশু উধম সিংহ। বিশ বছর পর ১৯৪০ সালের ১৩ মার্চ উধম সিংহ সেই গণহত্যার অপর নায়ক মাইকেল ও ডায়ারকে লন্ডনে হত্যা করেন। তিনি নির্ভীকভাবে ধরা দেন। ১৯৪০ সালে ৩১ জুলাই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফাঁসিতে হত্যা করে।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, আজ দেশের ইতিহাস থেকে মহান মনীষী তথা আপসহীন সংগ্রামীদের নাম পরিকল্পিতভাবে মুছে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ব্যাপক প্রসার ঘটানো হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে আপসহীন বিপ্লবীদের শিক্ষায় বলীয়ান হয়ে ছাত্র-যুবদের এগিয়ে আসতে হবে।

মহান মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে নানা অনুষ্ঠান

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন

ভারতের নবজাগরণের বলিষ্ঠতম চরিত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১২৫তম প্রয়াণ বার্ষিকী ২৯ জুলাই রাজ্য জুড়ে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালিত হল। রাজ্যের অসংখ্য গ্রাম-শহর-গঞ্জে রাস্তার মোড়ে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নানা ক্লাব, লাইব্রেরি ইত্যাদিতে ডিএসও, ডিওয়াইও, এমএসএস, কমসোমল-এর উদ্যোগে এই মহান মনীষীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান ছাত্র-যুব-মহিলা সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ। সকালে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে সংগঠনগুলির উদ্যোগে বিদ্যাসাগর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। সমাজের মধ্যে যে পঙ্কিলতার স্রোত বয়ে যাচ্ছে তাকে প্রতিরোধ করার শক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি পরিবারে ওই দিন সকালে পরিবারের সকলকে নিয়ে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করার উদ্যোগ নিতে বিদ্যাসাগর-শরৎ অ্যাকাডেমি আহ্বান জানিয়েছিল। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিটি জেলাতেই হাজার হাজার পরিবার এই উদ্যোগ নিয়েছিল।

কলেজ স্কোয়ার

মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগর স্মরণ অনুষ্ঠানে বহু মানুষ সমবেত হন। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট জনেরা। ৩১ জুলাই বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের বেনাচিতি হাইস্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির দুর্গাপুর শাখার ডাকে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য জুড়ে আরও অসংখ্য জায়গায় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেদিনীপুর শহর

বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশি হামলার ঘটনায় বাসদ (মার্কসবাদী)-র নিন্দা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ২৮ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, তেল-গ্যাস-খনিজ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে পুলিশ হামলা চালিয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ-সম্পাদক শরিফুল চৌধুরী সহ জাতীয় কমিটির অর্ধশত নেতা-কর্মীকে আহত করেছে। দেশের জাতীয় সম্পদ সুন্দরবন ধ্বংস করতে সরকার জনসাধারণের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও সকল মতামত উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ গায়ের জোরে ভারতের এনটিপিসি কোম্পানির সাথে চুক্তি করে রামপাল ও ওরিয়ান বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে। তেল-গ্যাস-খনিজ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভয়াবহতা তুলে ধরে সারা দেশের মানুষের মধ্যে মতামত তৈরি করে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু মহাজোট সরকার কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে দেশের স্বার্থ সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় তৎপর ভূমিকা পালন করছে। দেশের মধ্যে যেন কোনও ধরনের প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে এই জন্য সরকার ফ্যাসিস্ট কায়দায় এ সকল প্রতিবাদ কর্মসূচি দমন করছে।

কমরেড চৌধুরী বলেন, গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে পুলিশের হামলা সরকারের ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ। আজ পুলিশ প্রশাসন সরকারের দলীয় আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তিনি অবিলম্বে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করে জাতীয় কমিটির ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান এবং একই সাথে হামলায় জড়িত দায়ী পুলিশের বিচার দাবি করেন। তিনি দেশের সচেতন জনসাধারণকে সুন্দরবন ধ্বংস সহ মহাজোট সরকারের জাতীয় স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org